Tito
Signature Not Verified
Digitally signed by Tito
DN: cn=Tito, o=Muktadhara, c=AU
Date: 2005.03.07 15:46:59 +11'00'

অঘোষিত যুদ্ধের ব্লুপ্রিন্ট

১. প্রচার মাধ্যমে নানাভাবে বোমা-গ্রেনেড হামলার ঘটনা উঠে আসছে। বেশকিছু পত্র পত্রিকায় বোমা-গ্রেনেড হামলার লক্ষ্য যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাও বলা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, এই হামলাগুলো কি শুধুই সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর ? রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কথা আসলেই চলে আসে দলের কথা, স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রশ্নটি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য আছে। থাকবে, এটাই গণতান্ত্রিক রীতি ও পদ্ধতি। কিন্তু এই 'স্বাভাবিকতা' বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ; পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 'অস্বাভাবিকতার' অভ্যন্তরে ধর্মীয় ভিত্তিতে শোষণ-শাসন, জাতিস্বত্বা বিলোপের নিরবচ্ছিন্ন আগ্রাসী ধারায় মৌলিক দ্বন্দ্বগুলো প্রকট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় ভাবাবেগের উপরি-ফেনায়িত সময় অপসৃত হলে বাঙালি জাতির মধ্যে আত্ম-উপলব্ধির তাড়না দেখা দেয়। ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতি জীবনচর্যা সব কিছুরই উপরেই যখন পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ক্রমাগত আঘাত হানতে থাকে, জাতিগত শোষণ যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে, তখনই পুনরায় শুরু হয় বাঙালির শেকড় সন্ধান। দেখতে চায় তার ইতিহাস। খুঁজে পেতে চায় তার ঐতিহ্য। আদিকাল থেকে তার জাতীয় চরিত্র অসম্প্রদায়িক, ধর্মে-বর্ণে পার্থক্য কিন্তু সাংস্কৃতিক বন্ধনে অমলিন, অকৃত্রিম। হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ সবাই মিলে পালা-পার্বনে,পূজা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একত্রে জড়িয়ে আছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছাপিয়ে সামাজিকতার মিলন-তীর্থ বড় হয়ে উঠেছে। এই যে সামাজিকতা তার রূপ অসাম্প্রদায়িকতা। গ্রাম-সমাজের এই স্বাভাবিক বাস্তবতাই আমাদের শাশ্বত সাংস্কৃতিক রূপের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য বাঙালি জাতির আবহমান কালের অর্জিত উজ্জ্বল ঐতিহ্য ; সেই ঐতিহ্যের নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় বাঙালি নিজেকে ধরে রেখেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে নানান আঘাতে, ভয়ংকর বিনাশী সব কর্মকান্ড থেকে। পাকিস্তানী শাসনযন্ত্র এটা বুঝেছিলো। বুঝেছিলো বলেই শেকড় থেকে বাঙালি জাতিকে ছিন্ন করার নতুন নতুন কৌশল। কখনো ধর্মের নামে, কখনো ইসলামের নামে, কখনো ভারত-বিদ্বেষ, কখনো রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ, নজরুলকে খন্ডিত করে। মায়ের ভাষা কেড়ে নিয়ে, আরবী হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টা। বাংলার নদী, মাঠ, নিসর্গ, ক্ষেত ও সাগরের সজল সুবাতাস ভুলিয়ে দিতে আরবের মরুদ্যান, লু-হাওয়ার কল্পকাহিনী তার সাথে প্রলোভিত স্বর্গীয় স্বপ্নাবেশ, বাঙালি জাতিকে ভুলিয়ে দেবার কত আয়োজন, কত প্রলোভন ও দাসত্ব সৃষ্টির নতুন নতুন ফাঁদ !

ফাঁদ ছিলো বলেই ফাঁদের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার অদম্য আগ্রহ। উজ্জীবিত মানসিকতায় নব নব অন্বেষা। অন্বেষায় আত্ম-উদ্বোধন। আত্ম-উদ্বোধনের প্রক্রিয়ায়

প্রহেলিকার অবসান অনিবার্য। সেই অনিবার্যতার পথ ধরেই চলে আসে জীবন-জীবিকার পথ চলা। বৈরী পথ চলতে গিয়ে পাকিস্তানীরা বুঝিয়ে দিলো পাকিস্তান বাঙালির দেশ নয়। বাঙালির দেশ সেই অনাদিকালের। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে তাই সমহিমায় যখন উচ্চারিত হলো এ দেশের নাম হবে 'বাংলাদেশ' তখন বঙ্গোপসাগরের গর্জন নিয়ে বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষ একাত্ম হলো। সর্বস্তরের মানুষ এক হলো। ঐক্যবদ্ধ হলো। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদি গ্রুপ, দল ও ব্যক্তিরা জনগণের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। জনগণ বললো, মুসলিম-হিন্দু হলেও আমাদের জাতিগত পরিচয় বাঙালি। বাংলা আমাদের দেশ। ভিত্তি বাঙালি জাতীয়তাবাদ ; প্রতিপক্ষরা বললো: না। ইসলাম মূল ভিত্তি। ধর্মের আবরণে টিকিয়ে রাখতে হবে এক পাকিস্তান। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেংগে গেলে, বাংলাদেশ পৃথক হয়ে গেলে, স্বাধীন হয়ে গেলে শোষণের ক্ষেত্র সংকুচিত হবে, শাসনের হাত খর্ব হবে। জনগণের নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষ শাসকগোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা। দ্বন্দ্ব প্রকট। একদিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা ও শোষণমুক্তি এবং অন্যদিকে মুসলিম জাতীয়তা বা ইসলামী জাতীয়তাবাদ, জাতি বিভাজনে সাম্প্রদায়িকতা এবং নগ্ন শোষণের ধারা। এই অব্যাহত প্রক্রিয়া জাতিগত শৃংখল। শৃংখল পরানোর জন্য চাই সান্ত্রি সেপাই-মিলিটারী। চাই কৃপাপ্রাপ্ত দালাল। দালাল হলেই চলবেনা। দালালদের মুখে তুলে দিতে দিতে নতুন শ্লোগান। 'পাকিস্তান না টিকলে ইসলাম টিকবেনা।' ইসলাম রক্ষার নামে নামানো হলো মিলিটারী। তাদের সঙ্গে চিহ্নিত সব দালাল। দাস মানসিকতায় কথিত দর্শন ইসলামী জাতীয়তা।

মুক্তিযুদ্ধে জামাত, মুসলিম লীগ ও কথিত অন্যান্য ইসলামী দলগুলো পাকিস্তান সামরিক শাসকদের পক্ষাবলম্বন করেই ক্ষান্ত হয়নি, জামাত-শিবির পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধীনে সশস্ত্র ট্রেনিং নিয়ে ঘাতক রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী গড়ে তোলে। প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। গ্রাম গঞ্জে অগণিত মানুষকে হত্যা করে। কয়েক লক্ষ বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। প্রায় তিন লক্ষাধিক মা-বোনের ইজ্জতহানি করে। মা-বোনদের 'গনিমতের মাল' হিসেবে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে তুলে দেয়।

দেশ স্বাধীন হলে এসব নরঘাতক, দেশদ্রোহীদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়, ভোটাধিকার রহিত হয়। দালাল আইনে তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে এসব ঘৃণ্য নরঘাতক, ধর্ষক, অগ্নিসংযোগকারীদের বিচারের সম্মুখীন করা হয়। পাকিস্তান মিলিটারীদের প্রদত্ত অগণিত অস্ত্র স্বাধীনতা বিরোধী জামাত চক্র ও উগ্র চৈনিক পন্থীদের কবজায় থেকে যায়। সমগ্র বাংলাদেশে তারা 'খতমের রাজনীতি' শুরু করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ও নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র সমর্পন করলেও স্বাধীনতা বিরোধীরা অস্ত্র ভান্ডার আগলে রাখে।

দেশে হত্যা খুন নৈরাজ্য বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বেড়ে যায়। এমতাবস্থায়, বঙ্গবন্ধু বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহতকরণ, জাতীয় ঐক্য, কলে-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও জন্ম-শাসনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ঘুনে ধরা প্রশাসন, প্রচলিত বিচার ও উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পুরনো ব্যবস্থা ভংগুর, নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি এই ক্রান্তিলগ্নে স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। বাংলাদেশে শুরু হয় প্রতিবিপ্লবী কর্মকান্ড। অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীর কারাগার থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। দালাল আইন তুলে নেয়া হয়। তাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। সংবিধান সংশোধন করে স্বাধীনতা বিরোধী জামাত, মুসলিম লীগকে দল গঠনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা বিরোধী দালাল চক্র ও নেতাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। শুধু তাই নয়, জিয়াউর রহমান চিহ্নিত স্বাধীনতা বিরোধী শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী ও আব্দুল আলীম প্রমুখকে মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভূক্ত করে। জিয়াউর রহমানের অনুসৃত নীতির ধারাবাহিকতায় বেগম খালেদা জিয়া স্বাধীনতা বিরোধী জামাতকে নিয়ে জোট গঠন করেন এবং তাদের মন্ত্রী সভা ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব প্রদান করেন।

২. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জামাত পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত হয়। পূর্ব হতে জামাত সারাদেশে যে ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো ক্ষমতার অংশীদারিত্ব নিয়ে তাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ও দেশব্যাপী জংগী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সিভিল প্রশাসন এমনকি শৃংখলা বাহিনীর মধ্যেও জামাত তাদের নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। জামাত-শিবির ও জংগীবাহিনীর আর্দশিক ভিত্ শক্ত হয়েছে। জামাত আদর্শের মূলকথায় গোলাম আযম বলেছেন, "আমরা কোনোদিনই বাঙালি জাতীয়তাবাদ মেনে নেবো না, আমাদের দর্শন ইসলামী জাতীয়তাবাদ।" অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বাধীনতার সেই মূল স্তম্ভকেই তারা অস্বীকার করে। তাদের অঙ্গীকার ইসলামী জাতীয়তাবাদ যা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দর্শন এবং লাদেন আদর্শ। সেই আর্দশিক অঙ্গীকারে ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেট হতে শিবির কর্মীরা ঢাকার রাজপথে ওসামা বিন লাদেনের ছবি বহন করে শ্লোগান দিয়েছিলো 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান।' এরপরই ১৯৯৯ সালের ৯ই মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভায় ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা মওলানা ফজলুল হক আমিনী আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে

বলেন, "লাদেন ও তালেবানপন্থীরা দু'হাজার সালেই বাংলাদেশে ক্ষমতায় যাবে।" আফগান তালেবানদের আক্রমনের বিষয় ছিলো হাজার হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্য, পুরনিদর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, সিনেমা হল, ভিডিও শপ, টিভি ইত্যাদির ধ্বংস সাধন। তারা ১৯৯৯ সালের মধ্যে শত শত শিয়া মুসলমানদের হত্যা করে। তালেবান বাহিনী সৃষ্টি করেছিলো পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা। বিশ্বের ৪৩টি মুসলিম দেশ থেকে প্রায় ৫০ হাজার তরুণ মুসলিমদের প্রশিক্ষণ দেয়- যারা সরাসরি আফগান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৯৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী ওসামা বিন লাদেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ফ্রন্ট ফর জেহাদ' গঠন করেন এবং একটি চার্টার প্রণয়ন করেন। এই চার্টারে বাংলাদেশ থেকে ফজলুর রহমান স্বাক্ষর করেন। যিনি আরাকান রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে সশস্ত্র জংগী ক্যাম্প গঠন করেন এবং ঐ সব ক্যাম্পে জামাত-শিবির ক্যাডাররা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামে জামাত-শিবিরের শক্ত ঘাঁটি গড়ে উঠেছে। শিবির ক্যাডার হিসেবে চিহ্নিত ১৮ জন দুর্ধর্ষ জঙ্গী যারা চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে।

আলকায়দার সঙ্গে জামাত কানেকশন আজ প্রকাশ্য স্পষ্ট। ৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ সিলেটে আঞ্জুমানে খেদমতে কুরআন-এর ব্যানারে আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে তিন দিনব্যাপী তফসির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জামাত নেতা মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী উক্ত মাহফিলের প্রধান অতিথি। মাহফিল উপলক্ষে স্থাপিত স্টলগুলোতে ওসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার ও আল কায়েদা নেটওয়ার্কের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত অডিও-ভিসিডি ক্যাসেট প্রকাশ্যে বিক্রী হয়েছে ব্যাপকভাবে। ভিসিডির উপর লেখা আছে আল কায়েদা ও ওসামা, আল কায়েদার প্রশিক্ষণ, যোদ্ধাদের তৎপরতা, অস্ত্র ও লাদেনের ছবি ইত্যাদির সঙ্গে সাঈদীর বই পুস্তক। পরিবেশনায় ইসলামী কালচার ভুবন।

বাংলাদেশের বাংলা ভায়েরাও আল কায়েদা নেটওর্য়াকের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে জামাত এদের আড়াল করে চলেছে। জামাত প্রধান মতিউর রহমান বলেছেন "বাংলা ভাই বলে কিছু নেই, এটা মিডিয়ার সৃষ্টি।" কিন্তু অহরহ বাংলা ভায়ের রঙিন ছবি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এসব মিথ্যাচার ও কৌশল গ্রহণে জামাতের জুড়ি নেই।

৩. বাংলা ভাই-এর সন্ত্রাসী গ্রুপ তালেবান স্টাইলে ২০০৪ সনের এপ্রিল মাসেই কুপিয়ে জবাই করে, নির্যাতন করে, তাদের মৃত্যু চিৎকার মাইকে প্রচার করে, বেদম পিটিয়ে হত্যা করেছে ওয়াসিম ওরফে ওসমান, গোলাম রব্বানি মুকুল, মুশারফ হোসেন, সাইফুল, দীপঙ্কর রায়, নঁওগার কাশিয়া বাড়ি ইউপি দফাদারকে, মে মাসে অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য শেখ ফরিদকে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে ও অজ্ঞাত আরো তিনজনকে হত্যা করে এবং বাগমারার নিমপাড়ার রাবেয়া খাতুনকে ধর্ষণ করে, লজ্জায়

সে আত্মহত্যা করে। সবচেয়ে নৃশংস ঘটনা বগুড়ার নন্দিগ্রাম থানার বামনগ্রামে রাস্তার পাশে গাছে উল্টো করে আব্দুল কাইউম ওরফে বাদশার লাশ প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা। জুন মাসে শত শত মানুষের সামনে পিটিয়ে হত্যা করে রানীনগরের খেজুর আলী, আফজাল হোসেন ও ইয়াছিন আলীকে। জুলাই মাসে নাটোরে অজ্ঞাত তিনজনকে হত্যা করে বাসুদেবপুর লাইনের পাশে ফেলে রাখা হয়। নবেম্বরে পিতার সামনে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে এবং স্ত্রী কন্যার সামনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় জিয়াউল হক জিয়া ও আলী আকবরকে। এই হত্যাযজ্ঞ এখনো চলছে। হাজারও মানুষ বাংলা ভাইয়ের নির্যাতনের শিকার। বাংলা ভাই এখন সারা দেশে এক মূর্তিমান আতঙ্ক। মোল্লাতন্ত্রের নামে জামায়াতী ও লাদেনতন্ত্র কায়েম করার গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়নে অঘোষিত নীতির সক্রিয় অংশীদার 'বাংলা ভাই'।

বাংলা ভাইদের সশস্ত্র উত্থান, সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা ও মদদে মৌলবাদীদের প্রকাশ্যে প্রশাসন চালু ও ইসলামের নামে জঙ্গী অনুশাসন সৃষ্টির পাঁয়তারার সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে জামায়াত। আপাতত জামায়াতকে জোটের ছোট শরিক দল বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বিবেচনায় জামায়াত নেতারাই জোটের আদর্শিক নেতা হিসাবে কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। ঢাকা শহরে জামায়াতের সবচেয়ে বড় ইউনিট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কমপক্ষে দু'শ শিক্ষক আছেন জামায়াত সমর্থক। বগুড়ার সিদ্দিকুল ইসমাল ওরফে কথিত 'বাংলা ভাই' জনকণ্ঠে পাঠানো ই মেইল বার্তায় বলেছিল, সব সেক্টরে তার লোক রয়েছে। সময় হলে সবাই প্রকাশ্য অবস্থান নেবে। জোট সরকার রোজ কেয়ামত পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার জন্য অর্থ, অস্ত্র এবং বিএনপি-জামায়াতকেন্দ্রিক প্রশাসন প্রভাবিত কর্মকাণ্ডের ফলাফল গ্রহণে 'বাংলা বাহিনীর' অপারেশন একটি পরীক্ষামূলক ঘটনা।

উত্তরাঞ্চলে কমপক্ষে ১৬ টি জঙ্গী সংগঠন কাজ করছে। এই সংগঠনগুলো হলো শাহাদাত ই আল হিকমা হারকাতুল জিহাদ, হিযবুত তাওহিদ, আল মুজাহিদ, জামায়াতি ইয়াহিয়া আল তুরাগ, আল হারাকাত আল ইসলামিয়া, আল মাহফুজ আল ইসলামী, জামাআতুল ফালাইয়া, তাওহিদি জনতা, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, জুমাতুল আল সাজ্জাদ, শাহাদাত-ই-নূব্যয়াত, আল তুরাত, ইসলামি বিপ্লবী পরিষদ ও জয়শে মোস্তফা। জামাআতুল মুজাহিদিন নেপথ্যে না থেকে একেবারে সামনে থেকেই কর্মকাণ্ড চালাতে শুরু করে। এদের ভেতর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শাহাদাত-ই-আল হিকমা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। জংগী কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে সবচে বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে জামাআতুল মুজাহিদিন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের হুজুরিপাড়ায় শক্তিশালী বোমাসহ জামাআতুল মুজাহিদিনের ৫ জঙ্গী আটক হয় ২০০৩ সালের ১২ মার্চ। এ সময় সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় আনুমানিক দেড় কেজি ওজনের একটি শক্তিশালী টাইম বোমা, একটি পেট্রোল বোমা ও দুটি ককটেলসহ বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরির সরঞ্জাম। সে সময় জঙ্গীদের কাছ থেকে সংগঠনের কিছু বই ও অডিও ক্যাসেট উদ্ধার করা হয়। বইগুলোর ভেতর দুটি ছিলো ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মাসুদ আযাহারের লেখা। পুলিশ ওই সময় জঙ্গীদের কাছ থেকে পাকিস্তানি ও ভারতের মুদ্রা উদ্ধার করে। উদ্ধার করে একটি পাসপোর্ট ও একটি মোবাইল ফোন। ২০০১ সালের পয়লা ডিসেম্বর ইস্যুকৃত পাসপোর্টটির নম্বর ছিল ০৮১২৭০১।

সিজার লিস্টে অডিও ক্যাসেট ও টাইম বোমার কথাও বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছিল; অডিও ক্যাসেটগুলোর ভেতর একটি জামাআতুল মুজাহিদিনের উত্থান এবং লক্ষ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ছিল। ওই ক্যাসেটে কর্মীদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য ছিলো। ওই ক্যাসেটটিতে বাগমারা, আত্রাই ও রাণীনগর এলাকায় অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি কীভাবে তারা নিচ্ছে এ ব্যাপারে কিছু বক্তব্য ছিল। এ ছাড়াও এক বছরের ভেতরেই তারা একটি বড় ধরনের 'বিপ্লব' ঘটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে কর্মীদের প্রস্তুতির কথাবার্তাও ছিল ক্যাসেটে।

বাংলা ভাইয়ের সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতার কথিত আমীর আবুদর রহমান সাংবাদিকদের তার সংগঠনের যে ধরনের নেতৃত্ব কাঠামোর কথা বলেছিলেন, ওই ক্যাসেটে জামাআতুল মুজাহিদিনেরও একই ধরনের নেতৃত্ব কাঠামোর কথা বলা হয়েছিল। তবে এর আগে একই বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারী দিনাজপুর শহরের গুড়গুলায় জামআতুল মুজাহিদিনের ছাত্রাবাসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এটিই জামাআতুল মুজাহিদিনের প্রথম আত্মপ্রকাশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ আহত অবস্থায় সংগঠনের ৩ ক্যাডারকে গ্রেফতার করে। পালিয়ে যায় আরও ১০ জন। এরপর উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে মোট ১১ জনকে আটক করে পুলিশ। জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার মহেশপুর গ্রামে ২০০৪ সনের ১৫ আগস্ট দিনাজপুরের মামলার প্রধান আসামী ওবায়দুল্লা ও মোস্তফাকে গ্রেফতার করা হয়। তারা ওই গ্রামেও তৎপরতা চালাচ্ছিল। সেখানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ও পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেবার ঘটনা ঘটে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে গ্রেফতারকৃত মারেফুল ইসলামের সঙ্গে বাংলা ভাই দীর্ঘদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজ করছে। এরা দুজনই জামাআতুল মুজাহিদিনের শক্তিশালী কর্মী। তারা সকলেই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'জামায়াতুল মুজাহেদীন' বাংলাদেশে ৫৪ সাংগঠনিক জেলা প্রতিষ্ঠা করেছে। ৭ শ' অত্যাধুনিক মসজিদ নির্মাণ করেছে। বিশেষ বিশেষ তারিখে রাত ১২ টার পর মসজিদগুলোতে পরিচালিত জঙ্গী সদস্যদের শারীরিক কসরত ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২০০৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরের গুড়পুকুরে ধরা পড়ে জঙ্গী চক্র। ক'দিন পর দিনাজপুরের পার্বতীপুর, চাঁপাইনবাগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট এলাকায় ধরা পড়ে জঙ্গীদের বিশেষ গ্রুপ। 'বাংলা ভাই'য়ের কথিত আধ্যাত্মিক নেতা আল কায়েদা সদস্য

আফগানিস্থান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসা মাওলানা আবদুল রহমান নিজের জঙ্গী তৎপরতার কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। '৭১ এর কুখ্যাত আলবদর হিসাবে পরিচিত আব্দুল্লাহ ইবনে ফজলে হোসেনের পুত্র এই আব্দুর রহমান রাজশাহীর বাগমারা মহিলা কলেজ মিলনায়তনে 'বাংলা বাহিনী'র অপারেশনের সমর্থনে দেয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, 'সারা দেশে আমরা জঙ্গী তৎপরতা চালাচ্ছি। সশস্ত্র ইসলামী বিপ্লবই আমাদের লক্ষ্য।'

৪. মানব উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণাপত্রে ধর্মীয় জঙ্গীদের উত্থানের মূল্যায়ন পর্বে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার পরিপন্থী ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে, অন্যান্য ধর্ম ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতি ভয়ভীতি প্রদর্শন ও আঘাত হানছে, সুফি সাধকদের উরসস্থান এবং ঐতিহ্যবাহী মাছ-কাছিমকেও শত্রু ঠাওরাচ্ছে, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মুক্তবুদ্ধির মানুষ নিধন উল্লাসে মত্ত। এসব কর্মকাণ্ড দেশকে মহাপ্রলয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
সারা দেশে জালের মতো বিস্তার করে আছে তাদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। জঙ্গীবাদীরা জনগণের মধ্যে এমনভাবে মিশে আছে যে, আলাদা করে তাদের চেনা কষ্টকর। ছদ্মনামসহ বিভিন্ন কোড নামে তারা মাঠ পর্যায়ে তাদের অপকর্ম চালিয়ে মানুষের মধ্যে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে ফায়দা হাসিল করার কাজে লিপ্ত। গ্রাম পর্যায়ে তাদের ডিউটি হলো চিরায়াত বাংলার ঐতিহ্যময় বিভিন্ন মেলা, আড়ং, যাত্রা, পূজামণ্ডপ, নাটক, গানের আসরের মতো অনুষ্ঠানগুলো পণ্ড করা। এবং তাদের সিদ্ধান্ত হলো এভাবে কোন মেলা বা যাত্রা অনুষ্ঠান পণ্ড করতে পারলে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বাঙালীর এই সংস্কৃতি। তাদের মতে, এগুলো বিধর্মী কাজ। তাই এসব নস্যাৎ ও ধ্বংস ঈমানী দায়িত্ব ও জিহাদী কর্তব্য। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ যশোরের টাউন হলে উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা মারা হয়। চারদিকে ঝলসে যায়। অন্ততপক্ষে ১৫০ জন মানুষ দগ্ধ হয় এবং মারা যায় ১০ জন। একই বছর ৮ অক্টোবর খুলনার আহমদিয়া মসজিদে বোমা মেরে হত্যা করা হয় ৮ জন নিরীহ মানুষকে। এরপর ২০০১ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে সিপিবির বিশাল জনসভায় বোমা হামলায় আহত হয় ৫০ জন এবং নিহত হয় ৫ জন। ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল আবহমান শাশ্বত মিলনমেলা জাতীয় উৎসব পয়লা বৈশাখে রমনার বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় ২০ জন আহত ও ১০ জন মারা যায়। ২০০১ সালের ৩ জুন গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর গির্জায় বোমা হামলা করা হয়। অন্তত ২৬ জন আহত হয় এবং মারা যায় ১০ জন। ২০০১ সালের ২৬ জুন নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের অফিসে বোমার আঘাতে নিহত হয় ২১ জন। আহতের সংখ্যা শতাধিক। ২০০১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বাগেরহাট কলেজ মাঠে এক সমাবেশে বোমা মেরে আহত করা হয় ১০০ জনকে এবং নিহত হয় ৮ জন। ২০০১ সালের ২৮

সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরার রুক্সি সিনেমা হলে ও সার্কাস প্যান্ডেলে বোমার আঘাতে প্রাণ হারায় ৩ জন, আহত হয় ১০০। ২০০২ সালের ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ৪টি সিনেমা হলে একই সঙ্গে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ১০০ জন আহত এবং মারা যায় ১৯ জন। ২০০৩ সালের ১৭ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের শখিপুরে পাগলার মেলায় বোমা ফাটিয়ে মারা হয় ৮ জনকে ও আহত হয় ১৫ ব্যক্তি। ২০০৪ সালের ১২ জানুয়ারি সিলেটের শাহজালালের মাজারে ওরস অনুষ্ঠানে বোমার আঘাতে মারা যায় ৫ জন, আহত হয় ৫০ জন। সিলেটে আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিতের সভায় বোমা হামলা হয়। ২০০৪ সালের ২১ মে সিলেটে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর অমানবিক গ্রেনেড হামলায় নিহত হয় ৩ জন ও আহতের সংখ্যা ৭০। ২০০৫ সালের ১৬ জানুয়ারি বগুড়ায় নাট্যানুষ্ঠানের প্যান্ডেলে বোমা মারা হয়। এতে আহত হয় ৩৫ ও নিহত হয় ২ জন। একই দিন নাটোরের একটি যাত্রামঞ্চেও বোমা হামলার ঘটনায় কমপক্ষে আহত হয় ৩৫ জন। রাজশাহীর বাগমারায় বাংলা বাহিনীর ক্যাডাররা একটি যাত্রার প্যান্ডেল ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। স্থানীয় বাংলা বাহিনীর ক্যাডার মোস্তাক ও মামুনের নেতৃত্বে পনের/বিশজনের ক্যাডার তাণ্ডবে অংশ নেয়। এর আগে তারা কোয়ালিপাড়ার বাড়ি ঘেরাও করে লবির উদ্দিনের পুত্র সাজেদুর রহমান সাজেদকে (৩৮) অপহরণ কর পাঁচ/ছয় কিলোমিটার দূরে তেলীপুকুর নামক স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা সাজেদকে পিটিয়ে হাত-পা-ভেঙ্গে দেয়। পিটুনির এক পর্যায়ে সাজেদকে মৃত ভেবে ক্যাডাররা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। অথচ যাত্রানুষ্ঠানের প্রশাসনিক অনুমতি ছিল।

২১ আগস্টের গণহত্যা : ট্রাকটি ছিল মঞ্চ। ছিলো আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে। স্টেডিয়ামের দিকে মুখ। ট্রাকের ডানে পেছনের দিকে লাগানো হয় ছোট্ট সিঁড়ি। শেখ হাসিনাকে বহনকারী বুলেটপ্রুফ মার্সিডিস ট্রাকের পেছনের দিকে রাখা সিঁড়ির গোড়ায়। ট্রাক থেকে মার্সিডিসের দূরত্ব প্রায় ১০ ফুট। সামনের আসনে বসা শেখ হাসিনা গাড়ি থেকে নেমেই সিঁড়ি দিয়ে ট্রাকে উঠে গেলেন। ট্রাকের পিছনের দিকে রাখা মাইকে তিনি বক্তৃতা করেন। জয় বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু শ্লোগান শেষ করে যখন মঞ্চ থেকে নেমে আসছিলেন তখনই বিস্ফোরিত হয় গ্রেনেড। একের পর এক।
২১ আগস্ট ২০০৪ শনিবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে বোমা ও গ্রেনেড হামলা এবং গুলি বর্ষণ করে উগ্র জংগীবাদীরা বুঝিয়ে দিল তাদের চ্যালেঞ্জ করার মতো কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ও জাতীয় নেতৃবৃন্দকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে নেতৃত্বশূন্য করার লক্ষ্যে এই নির্মম হামলা সুপরিকল্পিত। ঘটনাস্থলেই শহীদ হন জাতীয় নেত্রী আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা আইভি রহমানসহ ২১ জন।

পরে আরো একজন শহীদ হন। আহত হন জাতীয় নেতাসহ পাঁচ শতাধিক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-সমর্থক। শহীদদের মধ্যে আইভি রহমান, মাহবুব আলম (৪০) নেত্রীর দেহরক্ষী, মোস্তাক আহমেদ সেন্টু, আবুল কাশেম (৬০), মোয়াজ্জেম হোসেন (২৭), জাহেদ আলী (২৫), সুফিয়া বেগম (৩৫), হাসিনা মমতাজ রিনা (৩৫), লিটু মুন্সী (ওরফে লিটন) (৩০), বিজিয়া বেগম, রহিমা, রতন সিকদার, রফিকুল ইসলাম (আদা চাচা) (৫৫), কুদ্দুস পাটোয়ারী, বিল্লাল হোসেন, আতিক উল্লাহ শিকদার, আমিনুর রহমান, মামুন, আমিনুর ইসলাম, আফরোজ, কাশেম মিয়া, আবুল কালাম আজাদ উল্লেখ্য।

আহতদের মধ্যে জিল্লুর রহমান এম.পি, আমীর হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক এম.পি, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এম.পি, শেখ ফজলুল করিম সেলিম এম.পি, ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, কাজী জাফরউল্লাহ, এম.পি, মোঃ হানিফ, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ওবায়দুল কাদের, মাহমুদুর রহমান মান্না, আখতারুজ্জামান, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ, এডভোকেট রহমত আলী এম.পি, এডভোকেট সাহারা খাতুন, মমতাজ হোসেন, মাহবুবা পারভীন, মোতাহার হোসেন মোল্লা, আ ক ম বাহাউদ্দিন নাসিম, এস.এম. কামাল হোসেন, এনামুল হক শামীম, পঙ্কজ দেবনাথ, মশিউর রহমান হুমায়ুন, গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু, আক্তার হোসেন, মাহমুদ আলাম সেন্টু, মোর্শেদ কামাল, ইলিয়াস মোল্লা, নির্মল গোস্বামী, অজয় কর খোকন, নাসিমা ফেরদৌসী, শাহিদা তারেক দীপ্তি, ইয়াসমীন হোসেন, রাশেদা বেগম। এবং নজরুল ইসলাম বাবুসহ আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন সহযোগী অংগ সংগঠনের অসংখ্য নেতা-কর্মী সমর্থক গ্রেনেড হামলায় আহত হয়েছেন।

জঙ্গীদের হাত : আওয়ামী লীগের সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার ঘটনাটি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিচলিত করে তুলেছে। তাদের সন্দেহ এ হামলার পিছনে মৌলবাদী জঙ্গীদের হাত থাকতে পারে। এদিকে একের পর এক বোমা-গ্রেনেড হামলার পরিপ্রেক্ষিতে খোদ মার্কিন রাষ্ট্রদূতও এখন নিজেকে নিরাপদ মনে করছেন না এবং নিরাপত্তাহীনতার এই বিষয়টি তিনি সরকারকে জানিয়েও দিয়েছেন। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনার পর পরই খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন, পাওয়েল, সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকা প্রমুখ এ ঘটনায় নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি এর সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচারের তাগিদ দিয়েছিলেন। এ বাংলাদেশের কোন ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের এত উচ্চমাত্রার প্রতিক্রিয়া এই প্রথম। ঘটনার তদন্তে মার্কিন সহায়তার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল কিন্তু সরকার তাতে রাজি না হয়ে ইন্টারপোলের সহায়তার প্রস্তাবে সাড়া দেয়। মার্কিনীদের মতে ইন্টারপোল এ ধরনের ঘটনা তদন্তের জন্য উপযুক্ত কোন সংস্থা নয়।

গত ২৭ জানুয়ারি ২০০৫ দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কূটনীতিক, সাবেক অর্থমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য শাহ এএমএস

কিবরিয়াকে হবিগঞ্জে এক জনসভায় মৌলবাদী শক্তি জাতিকে মেধাশূন্য করে ইসলামী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে গ্রেনেড ছুঁড়ে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ, বাঙালিত্ব ও অসম্প্রদায়িক চেতনার ধারক, বাহক সাবেক অর্থমন্ত্রী আওয়ামীলীগ উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শাহ এ এস এম-এর ক্ষুরধার উগ্রজংগীবাদীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য ও লেখার জন্য হত্যা করা হয়। তারপূর্বে হত্যা করা হয়েছে মৌলবাদ বিরোধী লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হুমায়ন আজাদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুসকে। '৭১ সনে জামায়াত বুদ্ধিজীবিদের যেভাবে হত্যা করেছিলো এসব তারই ধারাবাহিকতা।

৫. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ : গাইবান্ধার বোনারপাড়া ও বগুড়ার সোনাতলায় শক্তিশালী বোমা উদ্ধারের পর ইসলামী জঙ্গীদের পরবর্তী টার্গেট নিয়ে শঙ্কিত সাধারণ মানুষ ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যই যে বোমাগুলো আনা হয়েছিল তা এখন পরিষ্কার। নিরাপত্তাজনিত কারণে বগুড়ার উন্মুক্ত স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হচ্ছে না। ইতোমধ্যে কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে।

২০০৪ সনের ১২ নবেম্বর গাইবান্ধার বোনারপাড়ায় রেল কামরা থেকে উদ্ধার করা শক্তিশালী বোমাগুলো যার কাছে পাওয়া যায় তার বাড়ি সাঘাটা এবং সে ইসলামী জঙ্গী সদস্য। গাইবান্ধায় পাওয়া বোমাগুলো বগুড়ার সঙ্গীত শিল্পী মমতাজের অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য আনা হচ্ছিল বলে জানার পর ২৪ নবেম্বর সোনাতলায় ওই স্কুল মাঠেই অনুষ্ঠিতব্য মমতাজের অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়:

বৈশাখী সঙ্গীতানুষ্ঠানে হামলা : সম্প্রতি রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার তাহেরপুর বাজারে আবুল খায়ের স্টীল মিলস্ লিমিটেডের উদ্যোগে আয়োজিত বৈশাখী সঙ্গীতানুষ্ঠান ইসলামী জঙ্গী বাহিনীর সশস্ত্র হামলায় পন্ড হয়ে যায়। এ সময়ে পদদলিত হয়ে একটি শিশু মারা যায়। জঙ্গী বাহিনীর হামলায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ কুদ্দুস বয়াতীসহ অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছে। জঙ্গীদের সাম্প্রতিক অভাবনীয় উত্থান দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। মাজার, সিনেমা হল, বিনোদনমূলক কর্মকান্ড ও শহীদ মিনার, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, ও জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে আসছে। ১৯৮০ সালের পর হযরত শাহজালাল (র)-এর মাজারে উরস অনুষ্ঠান বন্ধ করতে উগ্রবাদি রাজনৈতিক দল তৎপরতা শুরু করে। কিন্তু মাজারের ভক্ত-আশেকানদের মারমুখী অবস্থানের কারণে উরসবিরোধীরা বেশিদূর এগোতে পারেনি। প্রদর্শনীর আওতাভুক্ত সার্কাস, যাত্রা, নৃত্য, সঙ্গীত নানা বিনোদনমূলক কর্মকান্ড বে'দাত শেরেক বলে উল্লেখ করে। দেশের বিভিন্নস্থানে প্রকাশ্যে রেডিও, টেলিভিশন ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ওয়াজ করে। ওপেন কনসার্ট, সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজনেও বাধাবিপত্তির কারণে বাধা

হয়ে প্রশাসনকে এই সব অনুষ্ঠান প্রদর্শনী বন্ধের নির্দেশ দিতে হয়। অশ্লীলতা ও ইসলামের দোহাই তুলে বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই সব গোষ্ঠী বিরোধিতা করে। তাদের এই কর্মকাণ্ডে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা থাকায় নিজেদের জঙ্গীভাব আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী প্রকাশ্যেই ভাস্কর্য স্থাপত্য ও মাজার শরীফ গুড়িয়ে দেবার হুমকি দেয়। জামায়াত '৭১ সনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইসলামের নামে পাকিস্তানী ধারা প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর। সেই লক্ষ্যে তারা সর্ট টার্ম, মিড টার্ম ও লং টার্ম পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করে চলেছে। (পরিশিষ্ট) এই প্ল্যান বাস্তবায়নে প্রয়োজন অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও সুশৃংখল সংগঠন। ইতোমধ্যেই তারা সেই পরিকল্পনা নিয়েই দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে।

৬. অর্থ সংগ্রহ : দেশে জংগীবাদিরা এরই মধ্যে সংস্থান করেছে তাদের সম্ভাব্য বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ। এ দেশকে ইসলামী জঙ্গীবাদীরা তালেবানী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য অত্যন্ত কৌশলে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করেছে । বিভিন্ন নামে বেনামে তারা অর্থলগ্নির মাধ্যমে বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার নিট মুনাফা অর্জন করছে।

তাদের সুসংগঠিত জঙ্গী নেটওয়ার্ক অত্যন্ত মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতি সম্প্রতি মানব উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছে, মৌলবাদী জঙ্গী প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক নিট মুনাফা কমপক্ষে পাঁচ শ' কোটি টাকা। মৌলবাদী রাজনীতির জন্য বিদেশ থেকে প্রাপ্ত তহবিল দেশে ব্যাংকিং, চিকিৎসা, শিক্ষা, এনজিও এবং ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে আয় হচ্ছে পাঁচ শ' কোটি টাকা। মোট মুনাফার শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় করা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলবাদী দর্শনে বিশ্বাসীদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার কাজে। বাকি ৫০ ভাগ সুবিধাভোগী যারা মৌলবাদী দর্শনে বিশ্বাস করতে পারে তাদের পেছনে সেবা প্রদানের নামে ব্যয় করা হয়। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, এসব কর্মকাণ্ডে সরকারের অভ্যন্তরে জামাতপন্থীরা শুধুমাত্র ইন্ধনই যোগাচ্ছে না, তারা রাষ্ট্রকে পর্যন্ত ব্যবহার করছে। সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর জনপদে সরকার, পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায় 'বাংলা ভাই'য়ের অভিযানকে গবেষণাপত্রে 'অপারেশন রিসার্চ' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এদের অর্থ যোগান দিচ্ছেন সৌদি আরব, কুয়েত এবং মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ। ইসলামী ব্যাংক, আল বারাকা, আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এবং রাবেতা ইসলাম ও ইবনে সিনা হাসপাতালের মাধ্যমে জামাতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনকে অর্থ প্রদান করা হয়। ব্যাংকের একাউন্টনাম্বারসমূহ অনুসন্ধানে বিস্তারিত জানা সম্ভব। বর্তমান জোট সরকারে ধর্ম ব্যবসায়ী জামায়াত চক্রের শক্তিশালী অবস্থানের সুযোগে তারা গোটা বাংলাদেশে নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলছে। জামআতুল মুজাহিদীন, জাগ্রত মুসলিম জনতা, আল হিকমা, হিজবুত তাহরীসহ

বিভিন্ন নামে তারা কার্যক্রম চালাচ্ছে। রাজধানী ঢাকা থেকে বিভিন্ন জেলা শহর, কোথাও কোথাও প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে ধর্মীয় দর্শনের কথা বলে তারা অবস্থান নেয়। অবস্থান শক্ত হয়ে গেলে শুরু করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে অর্জিত মুনাফা দিয়ে চালাচ্ছে এসব কার্যক্রম। এরা পানের দোকানদারের পিছনে পর্যন্ত বিনিয়োগ করে। একটি সূত্র জানিয়েছে, রাস্তার পাশে পানের দোকান, স্বল্প মূলধনী চায়ের স্টলে তারা বিনিয়োগ করে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সরবরাহের জন্য। শুধু রাজশাহী শহরে কমপক্ষে ৫০ টি পানের দোকান রয়েছে। '৮০-র দশকের শেষ দিকে গোলাম আযমের জন্য 'ফ্রিক গোলাম আযম' নামে লাখ লাখ ডলারের চেক আসত। এখনও এই প্রক্রিয়ায় চেক আসা অব্যাহত রয়েছে। তবে এখন টাকা এলে সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ হচ্ছে। বিনিয়োগ অর্থ পরিচালিত হয় বিশেষ শুরা বোর্ডের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বেসকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক শিক্ষক এ-কার্যক্রমে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এসকল শিক্ষক শুধু অর্থ, ব্যবস্থাপনা ও জনসংযোগ কৌশল, স্থান ও টিম নির্ধারণ করে দেন। হিজবুত তাহরী, আল হিকমা এতদিন গোপনে কাজ করলেও তারা এখন প্রকাশ্য রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করছে। বিভিন্ন জায়গায় খেলাফত প্রতিষ্ঠায় সশস্ত্র ইসলামী বিপ্লবের কথা বলছে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যেই তারা সশস্ত্র অবস্থান নিচ্ছে।

সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণে অর্থ যোগানো : নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনীর আস সালাম মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশী আমেরিকান মুহম্মদ মোশাররফ হুসেন (৪৯) এবং মসজিদটির ইমাম ইরাকী ইমিগ্র্যান্ট ইয়াসিন মহিউদ্দিন আরিফের (৩৪) বিরুদ্ধে ৯ আগষ্ট চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে। মোট ১৯ অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের সদস্য এবং হুন্ডি ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে। কাঁধে রেখে নিক্ষেপযোগ্য মিসাইল ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থ পাচার করা হয় বাংলাদেশে মাদ্রাসায়। এসব মাদ্রাসা থেকে তৈরী হচ্ছে সন্ত্রাসী এ অভিযোগও করা হয়েছে মোশারফ হুসেনের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া তিনি পাকিস্তানের চরমপন্থী দল হিসাবে পরিচিত জামায়াতে ইসলামীরও সদস্য বলে চার্জশীটে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এই খবরটি প্রতিবারই আসছে বাংলাদেশের নাম এবং জামায়াতে ইসলামী চরমপন্থী মুসলমানদের সংগঠন। এ ছাড়া বেশ কিছু মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার নামে সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বলেও চার্জশীটে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. অস্ত্র : আই এস আই কানেকশন : চট্টগ্রামে চাঞ্চল্যকর অস্ত্রের চালান আটক ঘটনার হোতাদের অন্যতম চোরাচালানী হাফিজুর রহমানের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আইয়ের। হাফিজের সঙ্গে ছয় মাস আগে ঢাকার

একটি অভিজাত হোটেলে বৈঠক হয়েছে পাকিস্তানী শহীদ নামে এক বিশেষ ব্যক্তির। এরপর হাফিজ সফর করেছে পাকিস্তান, চীন, থাইল্যান্ড ও মিয়ানমার। এর পরই চট্টগ্রামে ধরা পড়ে অস্ত্রের বিশাল চালান। হাফিজ চট্টগ্রাম কক্সবাজার অঞ্চলে তৎপর ৫ সদস্যের একটি চোরাচালান সিন্ডিকেটের নেতৃত্ব দেয়। চট্টগ্রামে এ যাবতকালের বৃহত্তম অস্ত্রের চালান আটকের ঘটনা তদন্ত এবং হাফিজের নেটওয়ার্ক খুঁজতে গিয়ে সরকারী একটি সংস্থা এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে। হাফিজের নেটওয়ার্কের সঙ্গে রয়েছে কক্সবাজার এলাকার চোরাচালানী হামিদ,সফিউর, মিয়ানমারের জহির ও চট্টগ্রামের বার্মা রফিক। বার্মা জহিরের নেটওয়ার্ক বিশাল। সে মিয়ানমারের আকিয়াব বন্দরকে ঘিরে গড়ে ওঠা চোরাচালান চক্রের অন্যতম সদস্য। সেই মূলত মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে চোরাচালানীদের সমন্বয় করে। গত ১ এপ্রিল '০৪ শিল্প মন্ত্রী জামায়াত আমির মওলানা নিজামীর নিয়ন্ত্রণাধীন সিইউএফএল জেটি ঘাটে অস্ত্রের চালান আটকের আনুমানিক ১৫ দিন আগে নগরীর ষ্টেশন রোড এলাকায় একটি হোটেলে বৈঠক করেছে হাফিজ ও বার্মা জহির। গোয়েন্দাদের ধারণা, দু'জন এ কয়েকদিন চট্টগ্রামে অবস্থান করে অস্ত্রের চালান খালাসের বিষয়ে নানা আয়োজন করেছে। উল্লেখ্য, গত ১ এপ্রিল রাতে খালাসের সময় সিইউএফএল ঘাট থেকে আটক করা হয় দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অবৈধ অস্ত্রের চালান। যাতে ছিল ১১ লাখ ৪০ হাজার অস্ত্র ও গোলাবারুদ। মূলত চোরাচালানের কাজে পাকিস্তান কানেকশনের কারণে হাফিজ উর্দুতে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

৮. অর্ধলক্ষাধিক সুপ্রশিক্ষিত ইসলামী জঙ্গী : আন্তর্জাতিক ইসলামী সন্ত্রাসী গ্রুপ আল কায়েদার পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে ইসলামী গ্রুপ এই অর্ধলক্ষাধিক প্রশিক্ষিত জঙ্গী বাহিনী তৈরি করেছে। কয়েকটি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা ও দেশী-বিদেশী গণমাধ্যমের উদ্ধৃতি দিয়ে এসব তথ্য দেয়া হয়েছে বুধবার সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" শীর্ষক সেমিনারের মূল প্রবন্ধে।

বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ আয়োজিত এ সেমিনারে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত ফ্রিট এরগিন, রাশিয়া দূতাবাসের মিনিষ্টার কাউন্সিলর আন্দ্রে স্টারকভ এবং ফিলিপিন্স দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব আলফ্রেডো বোরলঙ্গা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব সিএম শফি সামি। মূল প্রবন্ধে কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, টাইম ম্যাগাজিন, ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউসহ দেশীয় কয়েকটি সংবাদপত্রের তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৫ ইসলামী জঙ্গী গ্রুপ সক্রিয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে হরকত-উল-জিহাদ, শাহাদাত-ই হিকমা, হিজবুত তাওহীদ, জামা'আতুল মুজাহেদীন, শাহাদত-ই-নবুয়ত, জাগ্রত মুসলিম বাংলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশ জামাত ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির। প্রবন্ধে জানানো

হয়, জাগ্রত মুসলিম বাংলার ৩০ হাজার কর্মী রয়েছে, যার মধ্যে ১০ হাজার সর্বক্ষণিক কর্মী। এছাড়া হরকত-উল-জিহাদের সঙ্গে আছে ১৫ হাজার নিয়মিত কর্মী। অন্য গ্রুপগুলোর আরও ৫ সহস্রাধিক কর্মী রয়েছে। এই কর্মীরা সুপ্রশিক্ষিত। দেশের ভেতরে ও বাইরে এরা প্রশিক্ষণ নিয়েছে। মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের বড় অংশ এই জঙ্গী গ্রুপগুলোর কর্মী বাহিনীতে রয়েছে। মূল প্রবন্ধে উদ্ধৃত কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, "বাংলাদেশের সব মুসলিম জঙ্গী গ্রুপ আল কায়েদা নেটওয়ার্কের সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে।"

৯. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : বর্তমানে বাংলাদেশে ১৬টি উগ্র মৌলবাদী জঙ্গী সংগঠন ইসলামী বিপ্লব ঘটনানোর লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানা যায়। তথ্যমতে সারাদেশে তাদের ৫০টির মত ঘাটি রয়েছে। আলমারকাজুল হাসপাতাল, ইবনেসিনা হাসপাতাল, ইসলামী ইন্সুরেন্স, মসজিদ মিসন, সিটি হার্ট মার্কেট সহ তাদের রয়েছে অসংখ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেখানে তাদের কর্মিদের স্থানিয়ভাবে কর্মসংস্থান সহ অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। সৌদি আরব, পাকিস্তান, লিবিয়া, কুয়েত সহ বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশ থেকে মসজিদ, মাদ্রাসা উন্নয়নের নামে এবং ইসলামী বিপ্লব ঘটাবার অঙ্গীকার করে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে যা তারা উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের পেছনে খরচ করে থাকে; ইসলামী যুব সংঘ, মসজিদ সমাজ এসব সংগঠনের নামে ধর্মপ্রাণ মুসলিম যুবকদের সংগ্রহ করে থাকে সেই সাথে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা থেকে সদস্য সংগ্রহ করে তাদেরকে ছাত্র শিবিরের কর্মী বানানো হয় এবং ইসলাম রক্ষার নামে প্রথমেই তাদের মধ্যে ভারত ও আমেরিকা বিরোধী মানসিকতা গড়ে তোলে পরে প্রশিক্ষণ দিয়ে উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের কাজে সম্পৃক্ত করে থাকে। ইসলামী ছাত্র শিবিরের সকল নেতা কর্মীদের পাকিস্তান, আফগানিস্তান, লিবিয়া, প্রভৃতি দেশে পাঠিয়ে বিশেষ সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হয়। এ ছাড়া চট্টগ্রামের গভীর অরণ্যে রয়েছে তাদের একাধিক সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা আই,এস,আই সরাসরি তাদের সাথে জড়িত। পাকিস্তানি হাই কমিশনের কাউন্সিলর শাহেদ মাহমুদ, শাহ জামান খান, আব্দুল মাজিদ খান, ফার্স্ট সেক্রেটারি ওয়াকার আহম্মেদ, ব্রিগেডিয়ার যোগীশ উদ্দিন তাদের তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

সম্প্রতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরকার জনরোষের চাপে শাহদাৎ-ই-আলহিকমা সংগঠনটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আরো রয়েছে জামায়াতুল মুজাহেদিন বাংলাদেশ, জামাআত-ই ইয়াহিয়া আল তুরাগি, হিজবুত তৌহিদ, আলহারাকাত, আলইসলামিয়া, আল মারকাজুল আল ইসলামী, জামায়াতুল ফালাইয়া, তৌহিদী জনতা, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, শাহাদাৎ-ই-নবুয়ত ইত্যাদি নামের উগ্র ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন।

মুহাম্মদপুরের নূরজাহান রোডে জামায়েত ইসলামী মহিলা সংস্থার নামে একটি কেন্দ্র রয়েছে যেখানে সারাদেশ হতে মহিলাদের এনে উগ্র মৌলবাদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

এই কেন্দ্রটিরও সার্বিক দায়িত্বে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী এম,পি। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা থেকে পরিচালিত এসব সংগঠনের কার্যক্রম শাখা প্রশাখার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা, থানা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত চালানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে নাটোর, পাবনা, চাপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, বগুড়ায় এসব সংগঠনের কিছু জঙ্গী কর্মীরা ধরা পড়ে এবং তাদের নিকট থেকে টাইম বোমা, বোমা সার্কিট, ব্যাটারি, রিমোট, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, অডিও ক্যাসেট, জেহাদী প্রচার পত্র পাওয়া গেছে। তারা নাশকতা মূলক কর্মকান্ড চালাতে গিয়ে ধর্মের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। জামাআতুল মুজাহেদীন জঙ্গী সংগঠনটি এখন খুবই শক্তিশালী। এই সংগঠনে বহু বোমা ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, ছাত্র শিবিরের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ক্যাডার রয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে রাজশাহীর পবা থানার দারুশাহু বাজারে জামায়াতে ইসলামের নেতা ডাঃ মোজাম্মেল হকের বাড়ীতে বোমা তৈরীর সময় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সাত জঙ্গী সদস্য আহত হয় পরে ২ জন মারা যায়। সি,আই,ডি তদন্ত কর চার্জশীট দাখিল করে। মামলা বিচারকার্যের জন্য আদালতে উঠলে সরকারের প্রভাবশালী শরীক দল জামায়াতে ইসলামের নেতাদের চাপে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। এমনভাবে জোট সরকারের শরীক দল হিসাবে জামাত বি.এন,পির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে উগ্র মৌলবাদী সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করে তুলেছে এবং অচিরেই এককভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ইসলামী বিপ্লব ঘটানো সহ মুসলিম বিশ্বের সুপার পাওয়ার হওয়ার কথা ভাবছে।

রাতে জঙ্গী প্রশিক্ষণ : শিবিরের ব্যাপারে সন্দেহ গাঢ় হচ্ছে হযরত শাহজালালের (র) মাজারের গজার মাছ ধ্বংস, উরসে বোমা, সেখানে ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা এসব ঘটনার পর থেকে সিলেট এমনিতে এখন দেশের একটি স্পর্শকাতর জোন। তার ওপর সর্বশেষ সেখানকার একটি মসজিদে রাতের বেলা কথিত একদল ইসলামী জঙ্গীর অবস্থান, স্থানীয় লোকজনের বিরোধিতার মুখে তাদের সরে যাবার ঘটনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এরা জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র শাখা ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মী।

পাহাড়ী এলাকায় জংগী প্রশিক্ষণ : হবিগঞ্জের পাহাড়ী এলাকায় একটি সিএনজি বেবিট্যাক্সিসহ এলাকাবাসী ইসলামী জঙ্গী গ্রুপ হিজবুল মুজাহেদীনের দুই সদস্যকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। আটককৃত মাওলানা তাজুল ইসলাম পুলিশকে জানায়, সে জঙ্গী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদীনের সদস্য। তারা দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বিভিন্ন মাদাসার ছাত্রদের গোপন আস্তানায় নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আফগানিস্তানে জিহাদে পাঠানোর জন্য কাজ করে আসছে।

প্রশিক্ষণ ঃ উত্তরাঞ্চল ঃ বর্তমানে জামায়াতের আশ্রয়ে জংগীরা দেশের উত্তরাঞ্চল জুড়ে বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। উত্তরাঞ্চলের প্রায় সবগুলো জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশকিছু মাদ্রাসাকে তারা তাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করছে।

সিরাজগঞ্জ, পাবনার বিল অঞ্চলের তাড়াশ, উল্লাপাড়া, চাটমোহর, ভাংগুড়া, আটঘড়িয়া, জামতৈল, সাইখোলা এলাকার প্রায় ২০টি মাদ্রাসায় তাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ওই মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষকরা প্রায় সবাই একই সংগে একাধিক মাদ্রাসাতে শিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। তথ্যানুসারে জানা যায়, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৫০টির অধিক এসব জঙ্গি সংগঠনের ঘাঁটি রয়েছে। যেমন- চাপাইনবাবগঞ্জে ৬টি, পাবনায় ৩টি, রাজশাহীতে ৬টি, সিলেটে ৬টি, মৌলভীবাজারে ৩টি, কুষ্টিয়ায় ৫টি, ঠাকুরগাঁয় ২টি, দিনাজপুর ৫টি, নিলফামারি ২টি, লালমনিরহাট ৩টি, এমন আরো বেশ কিছু ঘাঁটিতে তারা তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। চট্টগ্রামে জামায়াত-ই-ইয়াহিয়া আল তুরাগ, হিজবুল তওহীদ, সিলেটে-আল হারাকাত আল ইসলামিয়া, সিরাজগঞ্জ-পাবনায় আল মারকাজুল আল ইসলামী, মৌলভীবাজারে জামায়াতুল ফালাইয়্যা। উত্তর বঙ্গের কয়েকটি জেলায় জামায়াতুল মোজাহেদীন, তওহীদী জনতা, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট। শাহাদাৎ-ই-আল হিকমা নামের উগ্র জঙ্গী সংগঠনগুলো মূলত জামায়াতে ইসলাম বাংলাদেশের দ্বারা পরিচালিত গোপন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন।

ছাত্র পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয় নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে। ২০০২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত 'ক্যান সায়েন্স ডিসপ্রুভ গড' শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজনে যে সংগঠনের নাম দেয়া হয়েছিল সেটি হচ্ছে, 'থিংকিং ইয়ুথ'। তাত্ত্বিক আলোচনা ও প্রকাশনার নিয়মিত আয়োজনও রয়েছে তাদের। হিজবুত তাহরী আগে 'খিলাফাহ' নামে একটি বুলেটিন বের করত। হালে নাম রেখেছে 'খিলাফত'। সিলেটে এদের উপকার্যালয় রয়েছে। প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে 'সিরিজ অব থট' 'ইসলাম ইজ নট জাস্ট প্রেয়িং এ্যন্ড ফাস্টিং' ইত্যাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক গোলাম মাওলাসহ বুয়েটের বেশ কয়েক শিক্ষক এসব সংগঠনের অগ্রপথিক হিসাবে কাজ করছেন।

১০. **উগ্রজঙ্গি সংগঠন : জামাত কানেকশন** : বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে কাজ করলেও প্রায় সবখানেই জামায়াতে ইসলামের নেতারাই এগুলোকে পরিচালনা করে থাকে বলে প্রমান পাওয়া যায়। যেমন আল হিকমা এবং জামিয়াতুল মুজাহেদীন নামের সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে রংপুর, নরসিংদী, দিনাজপুর, বগুড়া, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, রাজশাহী, নাটোর, নওগা, চাপাইনবাবগঞ্জ, নিলফামারী, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, পার্বতীপুর, কুড়িগ্রাম ও এর থানা পর্যায় পর্যন্ত। আল মোজাহেদীনের নেতৃত্বে রয়েছে একাধিক বোমা ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ যারা পাকিস্তান-আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি ওয়াদুদ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে বোমা ও বিস্ফোরক এ বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। ময়মনসিংহ সিনেমা হলে বোমা হামলা তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। হিজবুল তওহিদ - হিজবুল তওহিদ নামের উগ্র মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন কাজ করছে, বরিশাল, গৌরনদী,

মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল সহ ঢাকার আশে পাশের থানাসমূহে-ঢাকার কেরানীগঞ্জ, চট্টগ্রামের হাট হাজারী এবং খুলনাতে এদের কর্মিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। হরকাতুল ইসলাম - রংপুর, কুড়িগ্রাম ও ঐ সকল জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৌলবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে। দুরন্ত কাফেলা - টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন থানা ও আশেপাশে কাজ করছে। হিজবুল মাহদী - জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, দিনাজপুর এলাকায় কাজ করছে। ইত্তেফাকুল উলেমা - জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল এলাকায় কাজ করছে। এসকল সংগঠনের প্রায় সবগুলোর সাথেই জামায়াতে ইসালামী বাংলাদেশের সংযোগ রয়েছে। এবং তাদের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ছত্রছায়াতেই তারা তাদের গোপন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামের কেন্দ্রীয় রোকন হেলাল মৌলভী তার নিজ বাড়ী নরসিংদী জেলার পলাশ কাঠপট্টি এলাকায়। এখানে প্রায়ই গোপন সভা হয়।

জামাতের সেসব সভার সারমর্ম হলো, এদেশ মুসলমানদের দেশ। এদেশে কোন ইহুদি নাসারা খৃস্টান, হিন্দু ও তাদের দালাল থাকতে পারবে না। তাদের শেষ শিকড়টি পর্যন্ত নিঃশেষ না করা পর্যন্তখ্যান্ত হওয়া যাবে না।

১১. কতিপয় নির্দেশ : জামায়াত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান গোয়েন্দা-সংস্থার প্রণীত নীলনকশা অনুযায়ী তারা গঠন করেছিল রাজাকার, আলবদর ও আলসামস্ বাহিনী। আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিল বর্তমান জামায়াত আমীর মতিউর রহমান নিজামী। সেদিন জামায়াত দেশের প্রগতিশীল জ্ঞানীগুণি, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বরেণ্য ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে। আজো সেই ধারা তারা অব্যাহত রেখেছে। তারা বর্তমানেও প্রণয়ন করছে, প্রগতিশীল দল, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিল্পী সাহিত্যিকদের। আওয়ামী লীগ, জাসদ, কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপসহ প্রগতীশিল রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, (যদি থাকে) মহাবিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, সাংবাদিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত, মুক্তিযোদ্ধা, (অস্বচ্ছল, অশিক্ষিত ছাড়া) সাবেক ছাত্র নেতা, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগ ও অন্যান্যদের স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, কর্মক্ষেত্র, কাজের ধরন, রাজনীতির সাথে যোগযোগের সূত্র, বিশেষ কোন দুর্বলতা ইত্যাদি সহ প্রতিবেদন তৈরী করে করনীয় সম্পর্কে অনুমোদন চেয়ে জামায়াতের বিশেষ কেন্দ্রীয় সেলে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ব্যবসা ক্ষেত্রও গার্মেন্ট, পরিবহন, স্বাস্থ্যখাত সহ সকল ক্ষেত্রে প্রগতিশীলদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা কেন্দ্রকে চিহ্নিত পূর্বক ব্যবসায়ে যৌথমালিকানা আছে কিনা, ব্যবসা ক্ষেত্রকে অস্থিতিশীল করার লক্ষে কি কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, দেশব্যাপী অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সারা দেশে প্রগতিশীলদের উপর আক্রমনের একটি নীলনক্সা তৈরীর কাজ জামাত ইতোমধ্যেই গ্রহন করেছে।

১২. মৌলবাদী নেতারা বাংলাদেশে : পাকিস্তান-ভারতের বিতর্কিত ইসলামী জঙ্গী নেতারা বারবার বাংলাদেশে। উদ্দেশ্যে গোপনে জঙ্গী মুজাহিদীন রিক্রুটিং পাকিস্তানের বিশেষ বিতর্কিত মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি আগেও ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। পাকিস্তানে নিজের দেশে বিতর্কিত নেতাকে মন্ত্রণালয় ভাল লোক হিসাবে অনাপত্তি দিয়েছে। একই সময়ে ভারত থেকে আসা মুফতি তায়্যেবুল ইসলাম কাশ্মীরীও তাঁর দেশে নানা কারণে আলোচিত-বিতর্কিত। দু'জনেই খতমে নবুয়্যতের নেতা। কাদিয়ানী ইস্যুসহ নানা কারণে উগ্র ভূমিকার এরা দু'জনেই স্ব স্ব দেশে বিশেষ সমালোচিত বিতর্কিত। মৌলবাদী দু'নেতাই এখানে এসেছেন জোটের মৌলবাদী শরিকদের আয়োজন-ব্যবস্থাপানায়। এঁদের মধ্যে পাকিস্তান পাঞ্জাবের সাবেক এমপি মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি গত সোমবার ঢাকায় আসেন। ভারতের খতমে নবুয়তের নেতা মুফতি তায়্যেবুল ইসলাম কাশ্মীরী এর মাঝে লালবাগ মাদ্রাসায় বক্তব্য রেখেছেন।

১৩. মামলার মৃত্যু : চার বছর আগে রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থল পল্টন ময়দানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সমাবেশে বোমা হামলার মামলাটির মৃত্যু হয়েছে। ২০০1 সালে এ নৃশংস সন্ত্রাসের ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছিলেন আর আহত হয়েছিলেন অর্ধশতাধিক মানুষ। দেশে বিভিন্ন স্থানে গত প্রায় ছয় বছরে সংঘটিত ৩৫টি বোমা হামলা মামলার তদন্তে একটিতেও তেমন অগ্রগতি নেই। আলোচিত মামলাগুলোর মধ্যে ফাইনাল রিপোর্ট দেয়া হয়েছে তিনটি মামলায়। তিনটি মামলার তদন্ত থেমে গেছে। সাতটি মামলা সাক্ষীর অভাবে অপমৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। আর একমাত্র ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীকে গ্রেনেড ছুড়ে হত্যা প্রচেষ্টা মামলা ঝুলে আছে। সাতক্ষীরার সিনেমা হল ও সার্কাস প্যান্ডেলে হামলা এবং খুলনার আহমদিয়া মসজিদে বোমা হামলার মামলাও। যশোরে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে হামলা ও নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বোমা হামলার তদন্ত-তৎপরতা থেমে গেছে। এমনকি ২১শে '০৪ আগস্টে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের জনসভা ও শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলার ঘটনারও তদন্ত এগোচ্ছে না। ৩৫টি হামলার ঘটনা ঘটেছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, সিনেমা হলে, রাজনৈতিক দলের সমাবেশে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থানে। এসব হামলায় মারা গেছেন ১৪২ জন, আহত হয়েছেন ৯১৩ জন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ঘটনার তদন্ত হয়নি। ধরা পড়েনি নেপথ্য জংগী ঘাতকেরা।

জামাতের টার্গেট দু'হাজার পনের সালের ভেতরেই তারা সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবে। সেই টার্গেট নিয়েই দেশব্যাপী তারা অঘোষিত যুদ্ধের ব্লুপ্রিন্ট নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমান বিরাজমান অবস্থা তাই প্রমাণ করে।